A-PDF Image To PDF Demo. Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রথম যুগ

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

গড়ার প্রথম যুগ

(১৯২১-১৯৩৩)

মুজফ্ফর আহ্মদ

ন্যাশনাল

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি

BHARATER COMMUNIST PARTY
GARAR PRATHAM YUGA
Muzaffar Ahmad

প্রথম মুদ্রণ—১৯৫৯

সপ্তম মুদ্রণ—অক্টোবর, ১৯৮৩

প্রকাশক

সুনীল বসু

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

১২ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট

কলকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রক ঃ

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

উৎপল প্রেস

১১০/১বি, রাজা রামমোহন সরণী

কলকাতা-৭০০ ০০৯

দাম ঃ ১,২৫

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত "নিউ এজ্"* মাসিক পত্রের সম্পাদক কমরেড অজয় ঘোষ ও সঞ্চালক কমরেড মোহিত সেন আমায় অনুরোধ করেন যে, আমি যেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রথম যুগ সম্বন্ধে আমার স্মৃতি বিজড়িত** একটি প্রবন্ধ লিখি। কমরেড মোহিত সেন এই অনুরোধও জানান যে, লেখাটি যেন তিন হাজার শব্দের বেশী না হয়। আমার মতো লেখকের পক্ষে এই রকম একটি লেখা তিন হাজার শব্দের বাঁধনের ভিতর তৈয়ার করা খুবই কঠিন কাজ। তবুও আমি চেষ্টা করেছি। তবে আমার মনে হয় তিন হাজার শব্দের সীমা আমি ছাড়িয়ে গিয়েছি। লেখাটি "নিউ এজ্"-এর ১৯৫৮ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত "পার্টি কংগ্রেস সংখ্যায়" ছাপা হয়েছে। মূল লেখাটি বাঙলায় ছিল এবং তা ১৯৫৮ সালের ১লা মে তারিখে দৈনিক "স্বাধীনতায়" ছাপা হয়েছে।

লেখাটি দিল্লীতে প্রেসে যাওয়ার আগে পার্টির পুরনো দিনের নেতাদের মধ্যে কমরেড এস. এ. ডাঙ্গে, কমরেড এস. ভি. ঘাটে, কমরেড রণদীবে ও কমরেড গঙ্গাধর অধিকারী তা পড়ে দিয়েছেন। দিল্লীতে পাঠাবার আগে কমরেড আবদুল হালীমকেও লেখাটি পড়ে শোনানো হয়েছিল।

---

* NEW AGE, Political Monthly of the Communist Party of India, Edited by Ajoy Ghosh and Published from 7/4 Asaf Ali Road, New Delhi-1.

**Reminiscent

হিন্দী ও মারাঠী ভাষায় এই লেখার অনুবাদ হয়েছে। সম্ভবত অপর দু' একটি ভাষায়ও তা অনুবাদিত হয়ে থাকবে, অন্তত হওয়ার কথা ছিল। লখ্‌নৌর "জনযুগ" আফিস হতে এই প্রবন্ধ হিন্দীতে পুস্তিকার আকারেও বা'র করা হয়েছে*।

সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে আমাদের পার্টি-সভ্যদের পড়ার উদ্দেশ্যেও বটে, বাঙলাতেও এই লেখা পুস্তিকার আকারে প্রকাশ করা হলো। এর পরে ইংরেজীতেও এই পুস্তিকা বা'র করা হবে। পুস্তিকাটি ছাপাবার সময়ে আমি দু-তিনটি নাম তাতে যোগ করেছি। অর্থ পরিষ্কার করার জন্য কয়েকটি বাক্যও তাতে সংযোজিত হয়েছে**।

এখানে একটি কথা ব'লে রাখা ভালো। এই প্রবন্ধটি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বারো বছরের ইতিহাস নয়। পার্টি গড়তে গিয়ে বারো বছরে কি ভাবে কাজ এগিয়ে গেছে তা আমি ছুঁয়ে গেছি মাত্র। তাও আবার সব কিছু ছোঁয়া হয়নি। কারণ, তিন হাজার শব্দের সীমা আমার সামনে প্রতিবন্ধক ছিল। বারো বছরের স্মৃতিকথা যদি আমি বিস্তৃতভাবে লিখি তবে তা একটি বড় মতো বই হয়ে যাবে। আমাদের একটি বড় অসুবিধা এই যে পার্টির ইতিহাস লেখার সব রকম মাল-মসলা আমাদের হাতের কাছে নেই। কমিউনিস্ট ইনটারন্যাশনালের দলীলপত্রগুলি মস্কোতে রক্ষিত আছে। এই সব দলীল, বিশেষভাবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কিত দলীলগুলি না পড়লে আমাদের পার্টির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা হওয়া অসম্ভব। এই সব কিছু সত্ত্বেও পার্টি সভ্যদের মধ্যে যাঁরা আমাদের পার্টি গড়ার প্রথম যুগ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না তাঁরা আমার এই লেখা হ'তে কিছু খবর অন্তত পেয়ে যাবেন।

কলিকাতা

২৩শে জুন, ১৯৫৯

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

---

*পরে জানা গিয়েছে যে ভারতের আরও কয়েকটি ভাষায় এই লেখাটি অনূদিত হয়েছে।

এই পুস্তিকার প্রথম মুদ্রণের পর ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড এর ইংরেজী সংস্করণও প্রকাশ করেছেন। ইংরেজীতে নাম দেওয়া হয়েছে **Communist Party of India : Years of Formation 1921-1933.

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রথম যুগ

"১৯২১ সালে উল্লিখিত কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল ব্রিটিশ ভারতে তার একটি শাখা স্থাপন সম্বন্ধে স্থির-নির্ণয় করল, এবং আসামী শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে, শওকত উসমানী ও মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ অন্যদের সঙ্গে নিয়ে এইরূপ শাখা সংগঠনসমূহের স্থাপনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে তার দ্বারা রাজা ও সম্রাটকে ব্রিটিশ ভারতের আধিপত্য থেকে বঞ্চিত করা হবে।" (ভারত গবর্নমেন্টের হোম ডিপার্টমেন্টের অধীন ইন্‌টেলিজেন্স ব্যুরোর ডিরেক্টরের তরফ হতে ১৯২৯ সালের ১৫ই মার্চ তারিখে মীরাটের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে দাখিল করা অভিযোগ পত্র হতে উদ্ধৃত।)

কমিউনিস্ট পার্টি কিভাবে ভারতে গড়ে উঠল সে সম্বন্ধে আমার স্মৃতিকথা লেখার জন্যে আমায় "নিউ এজ্" মাসিক পত্র হতে অনুরোধ করা হয়েছে। অল্প জায়গায় কমপক্ষে একটি পুরো যুগের কথা বলতে যাওয়া বড়ই কঠিন কাজ। তবুও আমি এ-বিষয়ে কিছু লিখতে চাই। কারণ, আগে আমি এই নিয়ে কখনও কিছু লিখিনি। অথচ কিছুকাল হতে আমাদের পার্টি গড়ার ইতিহাস নিয়ে দেশ-বিদেশে অনেকে অনেক কিছুই লিখেছেন। এই সব লেখার স্থানে স্থানে প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে কোনও মিল থাকছে না।

১৯১৭ সালে রাশিয়ার মহান অক্টোবর বিপ্লব ঘটে। এই বিপ্লব সম্পর্কে সাম্রাজ্যবাদী জগৎ অনেক বিকৃত খবর পরিবেশন করতে থাকে, যেমন রাশিয়ায় মেয়েদের জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হয়েছে, মায়েদের বুক হতে শিশুদের কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, ইত্যাদি। তা সত্ত্বেও রুশ বিপ্লবের কিছু কিছু প্রভাব আমাদের দেশের ওপরেও পড়েছিল। যদিও বাঙলায় সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের প্রথম পর্যায় ১৯১৭ সালে স্তিমিত হয়ে আসছিল, তবুও অন্য সব আন্দোলন ওই বছরেই প্রবলভাবে মাথা তুলল। রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি আন্দোলন ও খিলাফৎ আন্দোলনের কথা এই সূত্রে উল্লেখ করা চলে। দেশের নানা স্থানে বড় বড় সভা ও মিছিল হতে থাকে। কলকাতায় সব সভা ও মিছিলে আমি যোগ দিতাম। ১৯১৮ সাল হতে দেশের বহু স্থানে মজুরদের ধর্মঘট শুরু হয়ে যায়। ১৯১৯ সালে অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর

হত্যাকাণ্ড ঘটে। তা নিয়েও দেশময় বিক্ষোভ ফেটে পড়ে। ১৯১৯ সালেই ভারতের শাসন সংস্কার আইন পাশ হয়। এই আইন দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার অনুকূল না হওয়ায় তার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদের ঝড় ওঠে।

কাজের শুরু

এইভাবে আসে ১৯২০ সাল। আমি স্থির করে ফেলি যে, রাজনীতিই হবে আমার জীবনের পেশা। তার প্রায় দু'বছর আগে হতে আমি একটি সাহিত্য সমিতির সব সময়ের কর্মী হয়ে পড়েছিলেম। এই সমিতির কাজের মধ্য দিয়ে ৪৯ নম্বর বাঙালী পল্টনের হাবিলদার, পরে দেশ-বরেণ্য কবি কাজী নজরুল ইস্‌লামের সহিত চিঠি-পত্রের মারফতে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। পরে যখন বাঙালী পল্টন উঠে গেল তখন কাজী নজরুল ইস্‌লাম কলকাতায় এসে আমার সঙ্গে থাকতে লাগলেন। মিস্টার এ. কে. ফজলুল হক তখন কংগ্রেসের বামপন্থী নেতা হিসাবে পরিগণিত ছিলেন। ১৯২০ সালে তিনি একখানা বাঙলা দৈনিক কাগজ বার করবেন স্থির করলেন। নজরুল ইস্‌লাম ও আমি তার ভার নিলাম। আমাদের যুগ্ম সম্পাদনায় সান্ধ্য দৈনিক "নবযুগ" বের হলো। নজরুল ইস্‌লামের জোরালো লেখার গুণে প্রথম দিন হতেই কাগজখানা জনপ্রিয়তা লাভ করল। অবশ্য, বেশীর ভাগ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ আমিই লিখতাম।

অন্য সব বাঙলা দৈনিকের তুলনায় "নবযুগ"-এর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। তাতে কৃষক ও মজুরদের খবর বেশী বেশী ছাপা হতো। ফজলুল হক সাহেব তাতে বাধা তো দিতেনই না বরঞ্চ খুশিই হতেন। কাগজখানা বার করার মুখে আমার একজন বন্ধু (তিনি রাজনীতিক কর্মী ছিলেন না) আমায় বলে-ছিলেন যে "বাঙলা কাগজগুলি বড় বেশী ভাবপ্রবণ হয়। আপনারা সাধারণ মানুষের সম্বন্ধে, বিশেষ করে মজুর ও কৃষকদের সম্বন্ধে কিছু কিছু লিখবেন।" এটা তাঁর ওপরে রুশ বিপ্লবের প্রভাব ছাড়া আর কি হতে পারে? বন্ধুর পরামর্শে আমার মন সায় দিয়েছিল। সমুদ্রগামী জাহাজের নাবিকদের ভিতরে এবং যারা বাঙলা দেশের নদীপথে চলাচলকারী স্টীমারগুলিতে কাজ করতেন তাঁদের

ভিতরেও, আমি আগে হতেই যোরাফেরা করতাম। আমার জন্মস্থানের লোকেরা (বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত সন্দ্বীপ নামক দ্বীপে আমি জন্মেছি) বিপুল সংখ্যায় এইসব কাজ করতেন এবং আজও করেন। অন্য সব মজুরের কথা কাগজে লেখা তো হতোই, তবে জাহাজীদের সমস্যাগুলি আমি "নবযুগ"-এ বিশেষভাবে তুলে ধরতাম। তখন ভাবতেও পারিনি যে কাগজের এই লেখাগুলির ভিতর দিয়ে আমি তৃতীয় কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের দিকে ধীরে ধীরে আকর্ষিত হচ্ছি।

পার্টি গঠন

১৯২০ সালে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের দ্বিতীয় কংগ্রেসে (কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৯ সালে) লেনিনের ঔপনিবেশিক নিবন্ধ (কলোনিয়েল থিসিস) গৃহীত হয়। তখন হতে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল ঔপনিবেশিক দেশগুলির সহিত যোগাযোগ স্থাপনের বিশেষ চেষ্টা শুরু করে। ভারতের ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট কিন্তু রুশ বিপ্লবের পর হতেই খুব সর্তক হয়ে ওঠে। তারা ভাবতে লাগল রুশ বিপ্লবের দেখাদেখি এদেশেও একটা কিছু ঘটতে পারে, কমপক্ষে একটি কমিউনিস্ট পার্টি তো গড়ে উঠতে পারেই। তার জন্যে তারা ভারত গবর্নমেন্ট হোম ডিপার্টমেন্টের অধীন সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোটিকে (আসলে ভদ্র নামে একটি পুলিস প্রতিষ্ঠান) নূতনভাবে গড়ে তুলল। বিভিন্ন প্রদেশে রাজনীতিক কর্মীদের চলাফেরার ওপরে নজর রাখার জন্য পুলিসের প্রাদেশিক ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ ও স্পেশাল ব্রাঞ্চ তো ছিলই, তার ওপরে আবার সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর গোয়েন্দারা দেশে সবত্র ছড়িয়ে পড়ল, এমনকি বিদেশেও এই ব্যুরোর এজেন্টরা কাজে নিয়োজিত হলো। এই রকম সজাগ পাহারা ও আটঘাট বাঁধা অবস্থায় আমরা কয়েকটি লোক ভারতের কয়েকটি জায়গায় একটি কঠোর কাজে হাত দিলাম। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, আমরা ভারতবর্ষেও কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তুলব। এটা ১৯২১ সালের শেষ ভাগের কথা। বলা বাহুল্য, আমরা কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়েছিলেম।

কলকাতা, বোম্বে ও লাহোরকে কেন্দ্র ক'রে আমাদের কাজ শুরু হলো। ১৯২১ সালে চীন ও ফরাসী দেশেও কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। এই দুই দেশে যাঁরা পার্টি গড়ার নেতৃত্বে ছিলেন তাঁদের তুলনায় আমরা ছিলেম অতি-[illegible]ত। আমার অযোগ্যতা সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেম। আমার মার্কসবাদের জ্ঞান ছিল ভাসা ভাসা। তবে আমি দুটি জিনিস সম্বল করে অকূল সাগরে ঝাঁপ দিয়েছিলেম। তার একটি ছিল জনগণের ওপরে ভরসা, আর দ্বিতীয়টি ছিল কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের নির্দেশের প্রতি অকুণ্ঠ নিষ্ঠা। এই দুটি জিনিস সম্বল নিয়েই যে-কেউ তখনকার দিনে কমিউনিস্ট হ'তে পারে বলে আমার মনে বিশ্বাস জন্মেছিল। ব্যক্তিগতভাবে আমার অর্থ-সামর্থ্য তো ছিলই না, থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও ছিল না। তবুও যে আমি লেগে থাকতে পারলাম, ভেঙে পড়লাম না, সে-শুধু আমার মনের জোরে। আজ ৩৭ বছর পরে ভাবতে আমার গা শিউরে ওঠে যে এই কিঞ্চিৎ মনের জোর আমার না থাকলে আজ আমি কোথায় থাকতেম।

কলকাতায় যখন কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার পরিকল্পনা চলছিল তখন কবি নজরুল ইসলামও তাতে ছিলেন। কিন্তু পার্টির শৃঙ্খলা মেনে চলতে পারবেন না ভেবে শেষ পর্যন্ত তিনি পার্টিতে যোগ দেননি। তবে, আমাদের সমর্থক তিনি বরাবর থেকেছেন। তাঁর লেখা ও কবিতা পড়লে তা সহজেই বোঝা যায়। পরে যে 'লেবর স্বরাজ পার্টি' গঠিত হয়েছিল তিনি ছিলেন তার প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের কয়েকজন আমায় বলেছিলেন, "আপনি কাজে এগিয়ে চলুন, আমরা আপনার সঙ্গে আছি।" কিন্তু আমি কাজে এগুতে গিয়ে দেখলাম তাঁরা আমার সঙ্গে নেই। ১৯২২ সালের শুরুর দিকে প্রথমে কমরেড আবদুর রজ্জাক খান (এখন রাজ্যসভার সভ্য) এবং পরে কমরেড আবদুল হালীম (এখন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সেন্ট্রাল কন্ট্রোল কমিশনের সভ্য এবং পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদেরও সভ্য) আমার সঙ্গে যোগ দিলেন। অসহযোগ আন্দোলনে খান সাহেব জেল খেটেছিলেন একবার, আর কমরেড আবদুল হালীম তাতে জেল খেটেছিলেন তিনবার।

১৯২২ সালে আর একজনকেও আমার বন্ধু হিসেবে পেলাম। তাঁর নাম ছিল কুতবুদ্দিন আহমদ। তিনি এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বিখ্যাত উর্দু পত্রিকা “আল-হিলাল” ও “আল-বিলাগ”-এর পরিচালনায় মাওলানা আবুল কালাম আজাদের সহযোগী ছিলেন। ১৯২২ সালে কলকাতার বাজারে মার্কসীয় সাহিত্য পাওয়া যেত না বললেই চলে, কিছু বই পাওয়া গেলেও তা কেনার সঙ্গতি আমাদের ছিল না। কুতবুদ্দিন সাহেব বই কিনতেন ও পড়তেন। তিনি কিনেছিলেন রুশ বিপ্লবের ওপরে প্রথম বই যা আমরা পড়ি ফিলিপস প্রাইসের লেখা “আমার রুশ বিপ্লবের স্মৃতি”।* আইয়েরা ফিলিপস প্রাইসের এই বইখানা তিনি না কিনলে আমরা কখনও তা পড়তে পেতাম না। তাঁর বাড়ীর দ্বার আমাদের জন্য হামিশা উন্মুক্ত থেকেছে। পরবর্তী সময়ে তিনিও ছিলেন লেবর স্বরাজ পার্টির আর একজন প্রতিষ্ঠাতা। অনেক পরে, বার্ধক্যের সময়ে তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতেও যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৪৮ সালে ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে তিনি মারা গিয়েছেন। আরও কয়েকজন সেই প্রথম যুগে আমাদের সঙ্গে এসেছিলেন। তাঁরা শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারেননি। তাঁদের সকলের কথা বললে লেখা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে।

বোম্বের কথা বলতে হলে প্রথমেই কমরেড শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গের কথা বলতে হবে। বি.এ পড়ার সময়ে ছাত্র-আন্দোলন করার জন্যে তিনি কলেজ হতে বহিষ্কৃত হন। অসহযোগ আন্দোলনে তিনি যোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু বেশীদিন গান্ধীবাদে তাঁর বিশ্বাস থাকেনি। ১৯২১ সালেই তাঁর “গান্ধী বনাম লেনিন”** নামক ইংরেজী বই প্রকাশিত হয়। ওই সময়ে গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে কলম ধরার জন্যে শক্ত বুকের পাটার দরকার ছিল। ১৯২২ সালে “সোশ্যালিস্ট” নাম দিয়ে একখানা ইংরেজী সাপ্তাহিকও ডাঙ্গে বা'র করেছিলেন। তার আগে “সোশ্যালিস্ট” নাম দিয়ে ভারতবর্ষে কেউ কখনও কোনও কাগজ বা'র করেননি। মজুরদের সঙ্গেও ডাঙ্গের যোগ আমার

---

*My Reminiscences of the Russian Revolution.

**Gandhi Versus Lenin.

চেয়ে বেশী ছিল। বোম্বেতে অন্য যাঁরা ছিলেন তাঁদের কথা আমি পরে বলব।

লাহোরে কাজ করছিলেন গোলাম হোসায়ন। তিনি আগে একটি গবর্নমেণ্ট কলেজের (পেশোয়ার ইসলামিয়া কলেজের) লেকচারার ছিলেন। তিনি ইকনমিকস পড়াতেন। খুশী মুহম্মদ ওরফে মুহম্মদ আলী এই গোলাম হোসায়নের বন্ধু ছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে লাহোর হ'তে কয়েকজন যুবক পালিয়ে (১৯১৫ সালে) উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের বাইরে চলে যান। তাঁরা কলেজের ছাত্র ছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের সীমার বাইরে থেকে তাঁরা দেশের বিপ্লবী কাজের জন্যে নিজেদের গড়ে তুলবেন। এই যুবকদেরই একজন ছিলেন মুহম্মদ আলী। রুশ বিপ্লবের পরে তিনি বিদেশে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। তিনিই কাবুলে এসে তাঁর বন্ধু গোলাম হোসায়নকে পেশোয়ার হতে ডেকে পাঠালেন। দুই বন্ধুতে অনেক আলাপ-আলোচনা হলো। পরে দেখা গেল যে চাকরী ছেড়ে দিয়ে গোলাম হোসায়ন কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে লাহোর চলে এসেছেন। এখানে "ইন্‌কিলাব" ("বিপ্লব") নাম দিয়ে একখানা উর্দু মাসিকের তিনি পরিচালনা করতেন। তখনকার দিনে বিখ্যাত এন. ডবলিউ. রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সেক্রেটারীও তিনি হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার কখনও দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। চিঠি-পত্রও আমি তাঁকে কখনও লিখিনি। ডাঙ্গের সঙ্গে চিঠি-পত্রের মারফতে আমার যোগ ছিল, তবে তাঁকে আমি প্রথম চোখের দেখা দেখেছিলেম কানপুর জেলে, ১৯২৪ সালে।

১৯২২ সালে মাদ্রাজের বৃদ্ধ উকিল মলয়পুরম সিঙ্গারাভেলু চেটিয়ারও নিজেকে কমিউনিস্ট বলে ঘোষণা করেন। তাঁর নিকটে ইংরেজী ভাষায় মার্কসীয় পুস্তকের একটি সংগ্রহ ছিল। মজুর আন্দোলনেও তিনি কাজ করতেন। বৃদ্ধ বয়সে তার জন্যে তিনি জেলও খেটেছেন। কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে (১৯২২) তিনিই স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন।

বিদেশে প্রচেষ্টা

বিদেশেও যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার কথা এখন বলা দরকার। ১৯২০ সালের মাঝামাঝিতে ভারতের দু'টি মুসলিম প্রধান প্রদেশ—সিন্ধু ও পাঞ্জাবে প্রবল হিজরৎ আন্দোলন হয়। হিজরৎ শব্দের মানে হচ্ছে অত্যাচারের হাত হ'তে বাঁচার জন্যে নিজেদের দেশ ও বন্ধুদের ছেড়ে যাওয়া। আঠারো হাজার মুসলমান এইভাবে আফগানিস্তানে চলে গিয়েছিলেন। পরে আফগান সরকার ভারতীয় হিজরৎকারীদের আফগানিস্তানে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। ভারতের তুলনায় আফগানিস্তান ছিল পশ্চাৎপদ দেশ। মুহাজিরদের, অর্থাৎ হিজরৎকারীদের ভিতরে কিছু সংখ্যক যুবকের তা মোটেই ভাল লাগছিল না। তাঁরা জিদ করতে লাগলেন যে তাঁরা তুর্কিতে চলে যাবেন এবং সেখানে গিয়ে তুর্কিদের হয়ে লড়াই করবেন। শেষ পর্যন্ত আফগান সরকার তাঁদের যেতে অনুমতি দিলেন। তাঁরা হিন্দুকুশ পর্বত পার হয়ে তিরমিজে (উজবেকিস্তানের এলাকা) পৌছুলেন। সেখান হতে আমুদরিয়ার জলপথে তাঁরা যখন এগিয়ে যাচ্ছিলেন তখন বিদ্রোহী তুর্কমেনরা তাঁদের আক্রমণ করল; এই তুর্কমেনরা ইংরেজদের নিকট হতে টাকা ও অস্ত্র পেতো। লালফৌজ এসে না পৌছুলে ভারতীয় যুবকদের জীবন সেদিন শেষ হয়ে যেতো। যে মুসলিম যুবকরা ইংরেজদের অত্যাচার এড়াবার জন্যে নিজেদের প্রিয় জন্মভূমি ভারতবর্ষ ত্যাগ করে এসেছিলেন তাঁরা আক্রান্ত হলেন মুসলিম তুর্কমেনদের দ্বারা। এর একটা দারুণ প্রতিক্রিয়া ভারতীয় যুবকদের মধ্যে হলো। তাঁরা লালফৌজের সঙ্গে একত্রে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে কিকির দুর্গ (তুর্কমেনিস্তানে অবস্থিত) রক্ষা করলেন। তারপর তাঁদের এক ভাগ তাসকন্দে গিয়ে সামরিক স্কুলে ভর্তি হলেন। তারও পরে তাঁরা গেলেন মস্কোতে। সেখানে মার্কসীয় ভাবধারা শেখাবার জন্যে যে প্রাচ্য বিশ্ববিদ্যালয় সবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাতে তাঁরা ভর্তি হলেন। এখানে কিছুকাল শিক্ষালাভ করে তাঁরা যখন মার্কসীয় মতাদর্শ গ্রহণ করলেন তখন তাঁরাই মস্কোতে ভারতের

কমিউনিস্ট পার্টি স্থাপন করলেন (১৯২১)*। তার পরে যতদিন প্রাচ্য বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ততদিন মস্কোতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির একটি শাখাও ছিল। এক সময়ে এই শাখার সম্পাদক ছিলেন আমাদের পাঞ্জাবের কমরেড নয়না সিং।

প্রাচ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে নয় মাস শিক্ষালাভ করার পরে ভারতীয় যুবকেরা দেশে ফিরে কাজ করার জন্যে বিচলিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু তাঁরা ফেরার পথ পাচ্ছিলেন না। দু'জন তো কোনও রকমে ইরানের পথে ফিরে এলেন। কিন্তু অন্যরা সব পথেই ব্যর্থ-মনোরথ হলেন। অগত্যা তাঁরা প্রস্তাব করলেন যে তাঁরা পামির পার হয়ে ভারতে ফিরে আসবেন। কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালকে তাতেই রাজি হতে হলো এবং গাইড সঙ্গে নিয়ে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল ভারতীয় কমরেডদের পামির পৌঁছিয়েও দিল। তারপরে তাঁরা অনেক কষ্ট ভোগ করে ভারতবর্ষের সীমার ভিতরে চিত্রল রাজ্যে পৌঁছেও গেলেন। কিন্তু সেখানে ভারতীয় পুলিস তাঁদের গিরেফ্‌তার করে পেশোয়ার জেলে নিয়ে এলো। দীর্ঘকাল তাঁরা হাজতে থাকলেন। তারপর তাঁদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের** ১২১-এ ধারা অনুসারে মোকদ্দমা হলো। ১৯২৩ সালের মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে তাঁদের বেশীর ভাগ লোকেরই প্রত্যেকের এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হলো, দু'জনের হলো প্রত্যেকের দু'বছরের সশ্রম কারাদণ্ড, আর একজনের নানান অভিযোগে ১০ বছরের কারাদণ্ড হলো।

পেশোয়ার ষড়যন্ত্র মোকদ্দমাই ছিল ভারতের প্রথম কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা। অবশ্য, এই মোকদ্দমার খবর আটক নদীর এদিকে বেশী পৌঁছয়নি।

---

* ভারতের প্রবাসী কমিউনিস্টদের দ্বারা মস্কোতে গঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির এই শাখাটি কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ("Up till now C. I. has acted upon the affiliation of the emigrant Section of the C. P. of India." M. N Roy's letter from C.I. headquarters, dated December 30, 1927).

**Indian Penal Code.

সেখানে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ছিল একরকম নিষিদ্ধ দেশ। পেশোয়ার মামলায় বন্দীদের ভিতরে মীর আবদুল মজীদ, ফিরোজুদ্দীন মনসুর* ও হবীবুর রহমান খান পার্টির কাজে সক্রিয় হয়েছিলেন। মীর আবদুল মজীদ মীরাট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমারও আসামী ছিলেন।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে ও বিদেশে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার চেষ্টা যেভাবে শুরু হয়েছিল তার কথা এখানে বলা হলো। কিন্তু ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসের পূর্বে ভারতের ভিতরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কোনও কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়নি।

কানপুর কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা

১৯২৩ সালের মে মাসে শওকত উসমানী (তিনি মস্কো হতে ইরানের পথে দেশে ফিরেছিলেন) কানপুরে গিরেফ্‌তার হন এবং আমি গিরেফ্‌তার হই কলকাতায়। তার কয়েক দিন পরে গোলাম হোসায়ন ও লাহোরে গিরেফ্‌তার হন। আমাদের তিন জনকে ১৮১৮ সালের ৩ নম্বর রেগুলেশন অনুসারে বিভিন্ন জেলে আটক করে রাখা হয়। ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে নলিনী গুপ্ত গিরেফ্‌তার হয়ে ১৮১৮ সালের ৩ নম্বর রেগুলেশন অনুসারে বন্দী হন। তিনি কোনও পার্টির সভ্য ছিলেন না, নিজেকে জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী বলতেন। তিনি ইউরোপ ও ভারতের মধ্যে আমাদের বার্তাবহের কাজ করতেন। তাঁর ভিতরে একটা দুঃসাহসিকতা ছিল বলেই বোধহয় তিনি আমাদের কাজ পছন্দ করতেন।

১৯২৪ সালের মার্চ মাসে ভারত গবর্নমেন্টের পক্ষ থেকে আমাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের ১২১-এ ধারা অনুসারে কানপুরের জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করা হয়। আসামী ছিলেন: (১) এস. এ. ডাঙ্গে, (২) শওকত উসমানী, (৩) মুজফ্‌ফর আহমদ, (৪) নলিনী গুপ্ত, (৫) গোলাম হোসায়ন, (৬) মলয়াপুরম সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার, (৭) রামচরণ

* এই পুস্তিকা ছাপাবার সময়ে ফিরোজুদ্দীন মনসুরের শোকাবহ মৃত্যুর খবর এসেছে। (লেখক)

লাল শর্মা ও (৮) মানবেন্দ্রনাথ রায় (এম. এন. রায়)। তাঁদের মধ্যে প্রথম চারজনকেই শুধু আদালতে হাজির করা হয়। সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার রোগে শয্যাগত ছিলেন বলে শুধু তাঁকে আদালতে হাজির না করিয়ে জামিনে ছেড়ে দেওয়া হয়। গোলাম হোসায়ন পুলিসের নিকট স্বীকৃতি দিয়ে ও ক্ষমা চেয়ে নিজের মুক্তি খরিদ করে নেন। আন্দামানে জেল খেটে মুক্তি পাওয়ার পরে রামচরণ লাল শর্মা দারুণভাবে পুলিসের দ্বারা উত্যক্ত হচ্ছিলেন। তার জন্যে তিনি পণ্ডিচেরিতে গিয়ে ফরাসী সরকারের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। তার ফলে তাঁকেও আদালতে হাজির করানো সম্ভব ছিল না। আর এম. এন. রায় ইউরোপে ছিলেন। তাঁকে আদালতে হাজির করার কোনও কথাই ওঠে না।

আমাদের চারজনের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চলল। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে ফরিয়াদী ছিলেন কর্নেল সি. কে.*। তিনি সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্স ব্যুরোর ডিরেক্টর ছিলেন। কর্নেল কে'র অনুরোধে খবরের কাগজওয়ালারা আমাদের মামলার শিরোনাম দিয়েছিলেন "কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা"। এর দ্বারা তিনি রাশিয়াকে জড়াতে চেয়েছিলেন। অবশ্য প্রচারের দিক থেকে।

মোকদ্দমা চলার সময়ে মাঝে মাঝে দর্শকের আসনে একজন লোক এসে বসতেন। তার নাম ছিল সত্যভক্ত। এটা কিন্তু তাঁর মা-বাবার দেওয়া নাম ছিল না। গান্ধীজীর সাবরমতী আশ্রমে তিনি এই নাম গ্রহণ করেছিলেন। সেখানে সত্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলত কিনা! যাক, আমাদের মোকদ্দমা যথাসময়ে দায়রার সোপর্দ হলো এবং সেসন জজ মিস্টার এইচ. এল. হোম** বিচার শেষ করলেন। আমাদের প্রত্যেকের ওপরে চার বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের হুকুম হলো। আমাদের জজ একজন সুখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বিখ্যাত চৌরিচৌরার মোকদ্দমায় একসঙ্গে ১৭২ জনের ফাঁসির হুকুম শুনিয়েছিলেন।

---

*Col. C. Kaye.

**H. L. Holme.

গলায় লোহার হাঁসুলি ও পায়ে লোহার মল পরিয়ে (এটাই ছিল তখনকার দিনে যুক্ত প্রদেশের জেলের কায়দা, অবশ্য জওহরলালের জন্য নয়।) আমাদের চারজনকে চার বিভিন্ন জেলে বদলী করে দেওয়া হলো। ফলে আমরা বাইরের জগৎ হতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। এদিকে সত্যভক্ত কাগজে ঘোষণা ছাপিয়ে দিলেন যে, তিনি ভারতীয় কমিউনিস্ট* পার্টি গঠন করলেন।

রায় বেরিলি ডিস্ট্রীক্ট জেলে একদিন আমার মুখ দিয়ে রক্ত উঠল। বাইরে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থার অভাবে আমার শরীরের ওপর দিয়ে যে-ঝড় বয়ে গিয়েছিল এটা ছিল তারই পরিণতি। জেলে সিবিল সার্জন-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বললেন এটা এমন কিছুই নয়। আমার শরীর কিন্তু ক্রমশই দুর্বল হচ্ছিল, অল্প অল্প জ্বরও হতো, আর শরীরের ওজনও দ্রুত কমে যাচ্ছিল। এই অবস্থায় আমায় আলমোড়া ডিস্ট্রীক্ট জেলে বদলী করা হলো। এটা ১৯২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের কথা। আলমোড়া যাওয়ার পরে ভারত গভর্নমেণ্টের হুকুম এলো যে স্বাস্থ্যের অজুহাতে আমায় জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হলো। সেদিন আমার শরীরের ওজন নেমেছিল মাত্র ৭৮ পাউণ্ডে।

আমার শরীর বড় দুর্বল ছিল, আর আলমোড়া স্বাস্থ্যকর পাহাড়। তাই মুক্তির পরে আমি সেখানেই থেকে গেলাম। সেখানেই আমি প্রথম শুনলাম এবং খবরের কাগজেও পড়লাম সত্যভক্ত ঘোষিত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির কথা। কাগজে এ খবরও পড়লাম যে ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে কানপুরে কমিউনিস্ট কনফারেন্স হতে যাচ্ছে। এই কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করার জন্যে লণ্ডনে কমরেড সাপুরজি সাকলাতওয়ালকে অনুরোধ করা হয়েছিল এবং তিনি নাকি আসতে প্রথমে রাজিও হয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টি তাঁকে আসতে অনুমতি দেয়নি। আমার মুক্তির জন্যে অভিনন্দিত করে সত্যভক্ত আমায় আলমোড়ায় পত্র লিখেছিলেন এবং তাতে এ-অনুরোধও জানিয়েছিলেন যে, আমি যেন কানপুরের কমিউনিস্ট কনফারেন্সে যোগ দিই।

---

*Indian Communist Party.

তখন আমার শরীর অনেক ভালো হয়েছিল, তার ওপরে ডিসেম্বরের শেষ দিকে থার্মোমিটারে তাপবিন্দু বরফ জমার কাছাকাছিতে নেমে এসেছিল। এই অবস্থায় আমায় কলকাতা ফিরতেই হতো, ভাবলাম, কানপুর হয়েই যাই।

কানপুর কমিউনিস্ট কনফারেন্স

কানপুর পৌঁছে দেখলাম কমরেড এস. ভি. ঘাটে, কে. এন. জোগলেকার ও আর. এস. নিম্বকার ইতোমধ্যে ওখানে পৌঁছে গেছেন। তাদের পেয়ে আমি অনেকটা আশ্বস্ত হলাম। কারণ, জেলে কমরেড ডাঙ্গের মুখে তাঁদের তিন জনের নামই আমি শুনেছিলাম। কানপুরে কমরেড অযোধ্যাপ্রসাদের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হলো। আরও কয়েকজনের সঙ্গে সেখানে দেখা হলো, আর দেখা হলো জানকী প্রসাদ বাগেরহাট্টার সঙ্গে।

কনফারেন্সে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন মাওলানা হস্‌রৎ মোহানী, আর মূল সভাপতি ছিলেন কমরেড সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার। (আমাদের সাজা হওয়ার পরে তিনি কানপুরের আদালতে হাজির হয়েছিলেন। কিন্তু ভারত সরকার তাঁর বিরুদ্ধে আর মোকদ্দমা চালাল না। আসলে খুব বেশী প্রমাণও তাঁর বিরুদ্ধে ছিল না।) প্রথমেই সত্যভক্তের সঙ্গে আমাদের বিরোধ বাধল। আমরা বললাম কমিউনিস্ট ইনটারন্যাশনালের কায়দা অনুসারে পার্টির নাম হবে—ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি,*—ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি** নয়। তিনি বললেন আন্তর্জাতিকতা তিনি মানেন না। তাঁর পরিকল্পিত পার্টি ভারতীয় ধাঁচের পার্টি, অর্থাৎ জাতীয়তাবাদী পার্টি, আর সেই জন্যে তার নাম হবে "ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি"। আমরা আমাদের মতে সুদৃঢ় থাকলেম। সত্যভক্ত তাঁর কাগজ-পত্র গুছিয়ে নিয়ে চলে গেলেন। তিনি বলেছিলেন তাঁর সভ্য-সংখ্যা তিন শতেরও বেশী। তাঁরা কারা ছিলেন তা আমরা কখনও জানতে পারিনি। কাগজ-পত্র নিয়ে সেই যে তিনি চলে গেলেন তার পরে তাঁর সঙ্গে আমার আর কোনও দিন দেখা হয়নি। কমরেড ঘাটের সঙ্গে তাঁর

---

* Communist Party Of India.

** Indian Communist Party.

নাকি একবার বোম্বেতে দেখা হয়েছিল। তিনি ঘাটেকে জানিয়েছিলেন যে, রাজনীতি হতে তিনি অবসর গ্রহণ করেছেন।

বিভিন্ন স্থানের কমিউনিস্টদের সংহত করে কানপুরের কন্‌ফারেন্সেই আমরা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি প্রথম গঠন করলাম। সম্মেলন খোলাখুলি ভাবে হচ্ছিল। তাই কমিটিও খোলাখুলিভাবে গঠিত হলো। এই খোলাখুলি সবকিছু করার জন্যে দেশে ও বিদেশে আমাদের অনেক সমালোচনা হয়েছে। এসব সমালোচনা আমাদের প্রাপ্য। কিন্তু আমাদের অন্য উপায়ও ছিল না। আমরা যদি কানপুরের কনফারেন্সে যোগ না দিতাম তবে ভবিষ্যতে সত্যভক্তর আলাদা কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে উঠতই, আর সেই পার্টি পদে পদে আমাদের পথে বাধার সৃষ্টি করত।

এর পরেও মাওলানা হসরৎ মোহানী কিছুদিন আমাদের সঙ্গে থেকে গিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন ভারতের একজন বিখ্যাত উর্দু কবি এবং দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন একনিষ্ঠ অগ্রণী সৈনিক। অনেক জেল তিনি খেটেছেন, নির্যাতনও তিনি অনেক সয়েছেন। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের আহ্‌মদাবাদ অধিবেশনে (১৯২১) ভারতবর্ষে তিনিই প্রথম স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। যদিও কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করেননি, তবুও এই প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্যে সেশন আদালতে তাঁর বিচার হলো এবং যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের সাজায় তিনি দণ্ডিত হলেন। বোম্বে হাই-কোর্ট পরে তাঁর এই সাজা বাতিল ক'রে দিয়েছিল। ১৯২৭ সালে তাঁর মুসলিম লীগে যোগদান আমাদের দ্বারা সমর্থিত না হওয়ায় তাঁকে আমাদের পার্টি ছেড়ে যেতে হয়। অবশ্য, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হতে কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। আমরা জানি ১৯২৮ সালের জানুয়ারী মাসে মুসলিম লীগের কলকাতা সম্মেলনে বড় বড় কংগ্রেস নেতারা যোগ দিয়েছিলেন।

কানপুরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম যে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হলো তার যুগ্ম সম্পাদক হলেন কমরেড এস. ভি. ঘাটে ও জানকী প্রসাদ বাগেরহাট্টা। ১৯২৭ সালের প্রথম দিকে জানকী প্রসাদের চালচলনে আমাদের মনে সন্দেহের

উদ্রেক হয় এবং তার সঙ্গত কারণও ছিল। আমরা যে জানকী প্রসাদের ওপর আর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছিনে তা সে বুঝতে পারে এবং তাই নিজে হতেই সে পার্টি হতে সরে পড়ে। তার অপসরণের পরে কমরেড ঘাটে পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী হলেন। তখন থেকে ১৯২৯ সালের ২০শে মার্চ পর্যন্ত তিনিই ছিলেন পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী। অনেক পরে আরও একবার তিনি পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী হয়েছিলেন।

১৯২৫ সাল হতে ১৯২৯ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অনেকগুলি গোপন বৈঠক বসেছে। কোনো কোনো বছর চারবার এ বৈঠক হয়েছে। ১৯২৮ সালের অক্টোবর মাসে বোম্বেতে আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির যে বৈঠকটি বসেছিল কেন জানিনে, মীরাট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার সেশন জজের রায়ে তা সমর পরিষদ (War Council) নামে অভিহিত হয়েছে। ১৯২৬ সালের শেষভাগে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম গঠনতন্ত্র প্রকাশিত হয়।

ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজান্টস্ পার্টি

এখন ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজান্টস্ পার্টি সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। ১৯২৩ সালে গিরেফতার হওয়ার পরে আমি কলকাতায় ফিরে আসি ১৯২৬ সালের জানুয়ারী মাসের ২রা তারিখে। আমার ফেরার আগে কলকাতায় একটি পার্টি গঠিত হয়েছিল। তার নাম ছিল 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের লেবর স্বরাজ পার্টি'*। "লাঙল" নাম দিয়ে এই পার্টির একখানা সাপ্তাহিক মুখপত্রও বার হয়েছিল। এই কাগজের প্রথম সংখ্যায় বিভিন্ন উপ-শিরোনামে বিভক্ত কবি নজরুল ইসলামের বিখ্যাত "সাম্যবাদী" কবিতা প্রকাশিত হয়। শুনেছিলাম রুশ ভাষায় এই কবিতার তর্জমা হয়েছিল। কিন্তু আমি তো কখনও চোখে দেখিনি। চারজন বন্ধুর উদ্যোগে "লেবর স্বরাজ পার্টি" প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁদের দু'জনের নাম আগেই উল্লেখ করেছি। আর দু'জন ছিলেন হেমন্ত কুমার সরকার ও সামসুদ্দীন হোসায়ন। শেষোক্ত বন্ধু

*The Labour Swaraj Party of the Indian National Congress.

ছিলেন কমরেড আবদুল হালীমের বড় ভাই। আজ তাঁদের চারজনের মধ্যে নজরুল ইসলাম ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই। বেঁচে থেকেও নজরুল মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতে জীবন্মৃত।

"লেবর স্বরাজ পার্টির" উদ্যোগে ১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কৃষ্ণনগরে (নদীয়া) একটি প্রজা সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে অনেক আলোচনার পরে "লেবর স্বরাজ পার্টির" নাম পরিবর্তিত হয়ে "পেজান্টস্ এণ্ড ওয়ার্কার্স পার্টি অফ বেঙ্গল" (বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল) হয়ে যায়। এর পরে এই পার্টি আর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত থাকল না। প্রস্তাব হয়েছিল পার্টির নাম করা হোক "বঙ্গীয় শ্রমিক ও কৃষক দল"। কিন্তু সম্মেলনে কৃষক প্রতিনিধির সংখ্যা বেশী থাকায় তা হতে পারেনি, কৃষকদের নামই আগে থেকেছে। পরে অবশ্য অপর একটি সম্মেলনে এই পার্টির নাম পরিবর্তিত হয়ে এর ইংরেজী নামটি অন্তত "ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজান্টস্" পার্টি হয়।

ধীরে ধীরে "লাঙল"-এর পরিচালনার ভার সম্পাদনা সহ আমার উপর পড়ল। তখনকার দিনে এই রকমই হতো। লোকের অভাব ছিল। অবশ্য কমরেড আবদুল হালীম আমায় সর্বতোভাবে সাহায্য করতেন। আমরা "লাঙল"-এর নাম পরিবর্তন করে "গণবাণী" করলাম। কারণ, "লাঙল" শুধু কৃষকের প্রতীক। কাগজখানা কিন্তু আসলে ছিল মেহনতী জনগণের মুখপত্র।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বিঘোষিত অবৈধ পার্টি না হলেও তার নামে খোলাখুলি কাজকর্ম করার অসুবিধা ছিল। যে-সব কাজ করার সিদ্ধান্ত আমরা কমিউনিস্ট পার্টিতে নিতাম সে-সব কাজ বেশীর ভাগই আমরা "ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজান্টস্ পার্টির" প্লাটফর্ম থেকে করতাম। বাঙলায় শ্রমিক ও কৃষক দলে কমিউনিস্টরা সংখ্যায় কম ছিলেন। তা সত্ত্বেও আমাদের কাজের ব্যাঘাত কখনও ঘটেনি।

১৯২৭ সালের শুরুতে বোম্বেতেও "ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজান্টস্ পার্টি" গঠিত হলো। কমরেড এস. এস. মিরাজকর হলেন তার সেক্রেটারী। ওই বছরে কানপুরে অল-ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সেখানে

পাঞ্জাবের কমরেড সোহন সিং জোশ ও ভাগ সিং কানাডিয়ানের সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় হয়। তাঁরা ওই উদ্দেশ্যেই এসেছিলেন। সোহন সিং তখন "কিরতী" নামক মাসিকপত্রের সম্পাদনা করতেন। "কিরতী" পাঞ্জাবী ভাষায় গুরুমুখী হরফে ছাপা হতো। এই কাগজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মস্কোর প্রাচ্য বিশ্ববিদ্যালয় হতে ফিরে-আসা কমরেড সন্তোক সিং। তিনি যক্ষ্মারোগে ভুগছিলেন এবং তাতে মারাও যান। তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় তো হয়ইনি, এমন কি লাহোরের কমরেড আবদুল মজীদের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হয়নি। ১৯২৪ সালে জেল হতে মুক্তি পেয়ে কমরেড আবদুল মজীদ লাহোরেই কাজ শুরু করেছিলেন। ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলন তো তিনি করতেনই, তা ছাড়া ১৯২৬ সালে যারা পাঞ্জাবের বিখ্যাত 'নওজোয়ান ভারত সভা'র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি তাঁদেরও একজন ছিলেন। যাক্‌, কানপুরে কমরেড সোহন সিং জোশ ও ভাগ সিং-এর সঙ্গে আমাদের বিশেষভাবে আলোচনা হলো। তার ফলে ১৯২৭ সালের শেষাশেষিতে পাঞ্জাবের "কিরতী কিসান পার্টি" (ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজাণ্টস্ পার্টি, গঠিত হলো। পাঞ্জাবে মজুর আন্দোলনও বিস্তৃতি লাভ করছিল। ধারিওয়ালে তো ভালো ইউনিয়নই হয়েছিল।

১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ফিলিপ স্প্রাট ও আমি নিমন্ত্রিত হয়ে মীরাটের একটি রাজনৈতিক সম্মেলনে যোগ দিতে যাই। কমরেড আবদুল মজীদ, সোহন সিং জোশ ও পূরণচন্দ্র জোশীও এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। পূরণচন্দ্র জোশীর সঙ্গে চিঠি-পত্রের পরিচয় তো ছিলই, মুখোমুখি পরিচয় তাঁর সঙ্গে আমার সেই প্রথম হলো। তিনি এম. এ. পাশ করার পরে তখন এলাহাবাদে আইনের পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। মীরাটের সম্মেলনে যুক্তপ্রদেশেও (এখন উত্তর প্রদেশ) "ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজাণ্টস পার্টি" গঠিত হলো। পূরণচন্দ্র জোশী হলেন তার সেক্রেটারী।

ওপরে আমি ফিলিপ স্প্রাটের নাম করেছি। তিনি ও বেঞ্জামিন ফ্রান্সিস ব্রাডলে (বেন ব্রাডলে) গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ছিলেন। তার আগে এসেছিলেন ব্রিটেনের পার্টির সভ্য জর্জ এলিশন। আমাদের কাজে

সাহায্য করার জন্যে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল তাঁদের ভারতে পাঠিয়েছিল। তাঁদের তিন জনই ভারতে কারাবরণ করেছেন। ফিলিপ স্প্রাট এখন দলত্যাগী। কমরেড জর্জ এলিশন ও কমরেড বেন ব্রাড্‌লে আজ আর বেঁচে নেই। জীবনে ভারতের কথা তাঁরা কখনও ভোলেননি।

আগে হতেই আমাদের স্থির ছিল যে, সব কটা শ্রমিক ও কৃষক দলকে একত্রে গ্রথিত করে সারা-ভারত শ্রমিক ও কৃষক দলে (All India Workers and Peasants' Partyতে) পরিণত করা হবে। তার জন্যে ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে কলকাতায় কন্‌ফারেন্স ডাকা হয়েছিল। এই সম্মেলন ঠিক সময়ে বসেছিল। সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন কমরেড সোহন সিং জোশ। বলা বাহুল্য, সারা-ভারত পার্টি গঠিত হয়েছিল।

এই সম্মেলন চলার সময়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এক বৈঠক হয়েছিল এবং আর একটি বৈঠক হয়েছিল সম্মেলন শেষ হওয়ার পরে, অর্থাৎ ১৯২৯ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে। এই শেষ বৈঠকে আমার সুপারিশে কমরেড সোহন সিং জোশ ও কমরেড পুরণচন্দ্র জোশীকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য করে নেওয়া হয়। পাঞ্জাবের শিখ সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং পাঞ্জাবে কাজ করেছেন এমন লোকেদের ভিতরে কমরেড সোহন সিংই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম পার্টি সভ্য। কমরেড সন্তোখ সিংকে যদি প্রথম পার্টি সভ্য হিসাবে ধরা হয় তবে কমরেড সোহন সিং জোশকে দ্বিতীয় পার্টি সভ্য হিসাবে ধরা হবে। একটি কথা মনে রাখতে হবে যে শিখ সম্প্রদায়ে জন্মেছেন এমন কমরেডদের মধ্যে কেউ বিদেশেও পার্টি সভ্য হয়েছেন। এবং একই সময়ে কলকাতায় কমরেড গেণ্ডা সিং (এখন বাবা গেণ্ডা সিং) পার্টি সভ্য হয়েছেন।

পুরণচন্দ্র জোশীকে পার্টি সভ্য করার সময়ে কেন্দ্রীয় কমিটি স্থির করে যে তাঁর নাম কোথাও লিখে রাখা হবে না। নিকট ভবিষ্যতে পার্টির উপর দিয়ে যে অত্যাচারের ঝড় বয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে তা থেকে অল্প বয়স্ক পি. সি.

জোশীকে বাঁচানোই ছিল কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য। কিন্তু তাকে বাঁচানো যায়নি।

কলকাতায় সম্মেলন (ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজান্টস্ পার্টির) যখন শুরু হচ্ছিল ঠিক সেই সময়ে ডকটর গঙ্গাধর অধিকারী জার্মানি হতে দেশে ফিরে আসেন। তিনি ছয় বছর জার্মানিতে ছিলেন। বার্লিন ইউনিভার্সিটি হতে ফিজিকাল কেমিস্ট্রিতে পি-এইচ-ডি ডিগ্রি পাওয়ার পরেও তিনি বার্লিনে একটা ফার্মে চাকরী করছিলেন। জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যও তিনি হয়েছিলেন। বোম্বেতে জাহাজ হতে নেমে তিনি সম্ভবত একদিন সেখানে ছিলেন। তার পরে চলে আসেন কলকাতায়। কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বিতীয় বৈঠকে তিনি যোগ দেন। জার্মানিতে পার্টি সভ্য ছিলেন বলে ভারতের পার্টিতেও তাকে সভ্য হিসাবে নেওয়া হয়।

আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তখনও কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের অঙ্গীভূত হয়নি। আমাদের পার্টি ছোট হওয়ার কারণে আমরা তা কখনও হতেও চাইনি। তবুও কার্যত কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল আমাদের তার অঙ্গ (সেকশন) হিসাবেই গণ্য করত। আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক যখন হচ্ছিল তখনই আমরা লোক মারফতে খবর পেলাম যে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের ষষ্ঠ কংগ্রেসের অধিবেশনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দু'জন সভ্যকে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের কার্যনির্বাহক কমিটির একান্তর সভ্য* ক'রে নেওয়া হয়েছে। তাই আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় স্থির হয় যে এই দুজনের একজনকে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের হেড কোয়ার্টার্সে পাঠানো হোক। কিন্তু সে-ব্যবস্থা করার আগেই আমাদের মীরাটের ডাক এসে গেল।

ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজান্টস্ পার্টির সম্মেলনের নামে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের কার্যনির্বাহক কমিটি বাণী পাঠিয়েছিল। এই বাণী সম্মেলন শেষ হওয়ার পরে এমন কি আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিংও শেষ হওয়ার

*Alternate member

পরে আমাদের হাতে পৌঁছেছিল। কাজেই, তা নিয়ে আলোচনার সুযোগ আমাদের ঘটল না। বাণীতে প্রথমেই পরিষ্কার করে দেওয়া হয় যে ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজান্টস্ পার্টি কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের অঙ্গীভূত প্রতিষ্ঠান নয়। আমরা যে দু'শ্রেণীর ভিত্তিতে রাজনৈতিক পার্টি গঠন করেছি তার একটি সমালোচনাও বাণীতে ছিল। কারণ পার্টি গঠিত হওয়া উচিত এক শ্রেণীর ভিত্তিতে। মজুর পার্টি ও কৃষক লীগ আলাদা আলাদা সংগঠন হওয়া উচিত, ইত্যাদি। এই নিয়ে কোনও আলোচনা তো হতে পেল না, শুধু ব্যক্তিগতভাবে এই সমালোচনার সারবত্তা আমরা উপলব্ধি করতে পেরে-ছিলাম।

১৯২৮ সালের মজুর সংগ্রাম

১৯২৭ সালের শেষভাগে দেশের বহুস্থানে মজুরদের লড়াই শুরু হয়। ১৯২৮ সালে এই লড়াইয়ের তীব্রতা ও ব্যাপকতা বেড়ে যায়। কমিউনিস্ট পার্টির প্রত্যেক সভ্য তো এই লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেনই, কৃষক ও শ্রমিক দলের সভ্যরাও (যাঁরা কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ছিলেন না) এই লড়াইয়ে নিজেদের সর্বতোভাবে নিয়োগ করলেন। ধর্মঘটের মিটিংগুলিতে শুধু আর্থিক দাবী-দাওয়ার ব্যাপারে বক্তৃতা হতো না, বক্তৃতা হতো রাজনৈতিক দাবী-দাওয়ার উপরেও। বোম্বেতে মজুরদের মধ্যে আমাদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বাঙলায়ও স্থানে স্থানে স্থাপিত হয়েছিল আমাদের নেতৃত্ব।

১৯২৮ সালের মজুর সংগ্রামের ভিতর দিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে শক্তিশালী পার্টিতে পরিণত করার অপূর্ব সুযোগ এসেছিল। বিপুলসংখ্যক মজুরের পার্টিতে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল। ধর্মঘটগুলির বক্তৃতার ভিতর দিয়ে রাজনৈতিক পার্টি সম্বন্ধেও মজুরেরা সচেতন হয়ে উঠেছিল। সাধারণ শ্রমজীবী জনসাধারণের উপরেও আমাদের প্রভাব পড়েছিল। যখনই কাজ শুরু করলে তাঁদের সকলের মধ্য হতে অনেকেই আমাদের পার্টিতে আসতেন। কিন্তু ভারত গবর্নমেন্ট আমাদের উপরে কঠোর আঘাত হানার

জন্যে তাদের অস্ত্র শানাচ্ছিল। জন নিরাপত্তা আইনের খসড়া* কেন্দ্রীয় আইন সভায় উপস্থিত করা হতে আমরা তা খানিকটা বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু আমরা যে আত্মগোপন করে কাজ করব সে-অবস্থাও তখন আমাদের ছিল না। এই সময়ে বোম্বেতে কমরেড এস. ভি. দেশপাণ্ডে ও কমরেড বি. টি. রণদীবেকে পার্টিতে নেওয়া হয়। অসহযোগ আন্দোলনের সময় কমরেড দেশপাণ্ডে কলেজ ছেড়েছিলেন। আর কমরেড বি. টি. রণদীবে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র। ইকনমিক্স্‌-এর এম. এ. পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছিলেন। ডক্টর গঙ্গাধর অধিকারী তাঁর মামাতুত দাদা এবং ডক্টর অধিকারীর নিকট হতে প্রেরণা লাভ করেই তিনি কমিউনিস্ট পার্টির দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমরা ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সহযোগে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে কলকাতায় একটি বিরাট মিছিলের পরিচালনা করি। আমাদের দিক হতে নানান স্লোগান সংবলিত পোস্টার প্রদর্শন করাই ছিল এই মিছিলের একটি বৈশিষ্ট্য। এই মিছিলেই আমরা ইংরেজিতে **Long Live Revolution** (বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক) স্লোগানটি ভারতের প্রথম প্রদর্শন করি। কেউ কেউ বলেন স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্যে মাওলানা হস্‌রৎ মোহানীর বিরুদ্ধে যে মোকদ্দমা হয়েছিল তার বিবৃতিতে তিনিই প্রথম ভারতে এই স্লোগান দিয়েছিলেন। মাওলানা হস্‌রৎ মোহানী আমায় তাঁর বিবৃতি একবার পড়ে শুনিয়েছিলেন। কিন্তু আজ আমি কিছুতেই মনে করতে পারছিনে যে এই স্লোগান তাঁর বিবৃতিতে ছিল কিনা। যদি থাকে তবে এই স্লোগান প্রথম দেওয়ার সম্মান তাঁর প্রাপ্য। আর তাঁর বিবৃতিতে এই স্লোগান না থাকলে তবে তা প্রথম দেওয়ার সম্মান আমাদের প্রাপ্য। কলকাতায় আমাদের শেষ কাজ ছিল ক্লাইব জুট মিলের মজুরদের স্ট্রাইক পরিচালনা করা। তার মূল দাবীতে আমরা জিতেছিলাম। তার পরেই এসে গেলো স্মরণীয় ২০শে মার্চ।

***The Public Safety Bill.**

মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জীবনে ১৯২৯ সালের ২০শে মার্চ ছিল সত্যই একটি স্মরণীয় দিন। ভারতের ব্রিটিশ সরকারের তরফ হতে যে আঘাত আমাদের ওপর হানার আশঙ্কা আমরা করেছিলেম, ২০শে মার্চ তারিখে সেই আঘাত আমাদের ওপরে সত্য সত্যই তারা হানল। মীরাটের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের পরওয়ানার বলে সেদিন ভারতের বিভিন্ন স্থানে ৩১ জন কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য, শ্রমিক ও কৃষক দলের সভ্য ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের নেতাদের গিরেফ্‌তার করা হলো। তাদের সকলকেই মীরাটে আনা হলো। ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের (ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের) ১২১-এ ধারা অনুসারে তাদের বিরুদ্ধে মামলা চলবে।

আসামীদের মধ্যে কমরেড বেঞ্জামিন ফ্রান্সিস ব্রাড্‌লে (বেন্ ব্রাডলে) ও ফিলিপ স্প্রাট (স্প্রাট এখন দলত্যাগী) ছিলেন গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, শামসুল হুদা, অযোধ্যা প্রসাদ, সোহন সিং জোশ, মীর আবদুল মজীদ, পূরণচন্দ্র জোশী, শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে, সচ্চিদানন্দ বিষ্ণু ঘাটে, কেশব নীলকণ্ঠ জোগলেকর, শান্তারাম সাবলারাম মিরাজকর, রঘুনাথ শিবরাম নিম্বকর, গঙ্গাধর মোরেশ্বর অধিকারী ও শওকত উসমানী ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য। রাধারমণ মিত্র ধরা পড়ার আগে শ্রমিক ও কৃষক দলের সভ্য হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। শিবনাথ ব্যানার্জী ও কিশোরীলাল ঘোষ কোনও পার্টির সভ্য ছিলেন না। এম. জি. দেশাইও কোন পার্টির সভ্য ছিলেন না, তবে তিনি আমাদের বন্ধু ছিলেন। বাকী আসামীরা সকলেই ছিলেন শ্রমিক ও কৃষক দলের সভ্য। আসামীদের তালিকায় পরে আরো দু'টি নাম যোগ হয়। তার মধ্যে এইচ. এল. হাচিনশন (ইংরেজ) কোনও পার্টির সভ্য ছিলেন না। আমীর হায়দর খান ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ছিলেন। তাঁকে অনেক চেষ্টা করেও পুলিশ গিরেফ্‌তার করতে পারেনি। গা-ঢাকা দেওয়া অবস্থায় তিনি মাদ্রাজে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলেন।

মোকদ্দমা চলার সময়ে আসামীদের পক্ষ হতে বিবৃতি দেওয়ার একটা সময় আসে। আমরা কমিউনিস্টরা আগে হতেই স্থির করে নিয়েছিলেম যে এমন বিবৃতি আমরা দেব যার দ্বারা কমিউনিস্ট মতাদর্শ ও কর্মসূচী দেশের সর্বত্র প্রচারিত হবে। কিন্তু বিবৃতি দেওয়া যখন শুরু হলো তখন প্রত্যেক আসামীই বিবৃতি দিলেন। শ্রমিক ও কৃষক দলের সভ্যদের মধ্যে কেউ কেউ স্বীকার করলেন না যে তাঁরা এই পার্টির সভ্য ছিলেন। কমিউনিস্ট বন্দীরা যেমন ঠিক করেছিলেন ঠিক সেই রকম বিবৃতিই দিয়েছিলেন। তাদের প্রত্যেকে আলাদা আলাদা বিবৃতি তো দিয়েছিলেনই, একটি যুক্ত বিবৃতিও তাঁরা দিয়েছিলেন। আমার মনে হয় এই বিবৃতিগুলি, বিশেষ করে আমাদের যুক্ত বিবৃতিটি এখন পড়লেও আজকার কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যরাও উপকৃত হবেন। আদালতে কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যরা বিবৃতিতে স্বীকার করেছেন যে তাঁরা কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য। ধরণীকান্ত গোস্বামী, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ চক্রবর্তী, গোপাল বসাক ও রাধারমণ মিত্র বলেছেন তাঁরা মতবাদের বিশ্বাসে কমিউনিস্ট (**Communist by conviction**)। ধরণীকান্ত গোস্বামী, গোপেন্দ্র চক্রবর্তী ও গোপাল বসাক ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজান্টস পার্টির সভ্য ছিলেন। ১৯৩৪ সালের কাছাকাছিতে তাঁরা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। পার্টির নির্দেশে কমরেড পি সি জোশীও বলেছিলেন যে তিনি মতবাদের বিশ্বাসে কমিউনিস্ট। কারণ, সরকারের হাতে এমন কোনও প্রমাণ ছিল না যে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য। হাচিন্সনও ব্যক্তিগত বিবৃতিতে নিজেকে কমিউনিস্ট বলেছিলেন। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে ফিরে গিয়ে তিনি লেবর পার্টিতে যোগ দেন।

একটি কথা এখানে বলে রাখা ভালো। কয়েক বছর আগে গোপাল বসাক ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি হতে বহিষ্কৃত হয়েছেন।

ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট হতে চৌধুরী ধরমবীর সিং মুক্তি পেয়েছিলেন। সেশন জজের কোর্ট হতে মুক্তি পেয়েছিলেন শিবনাথ ব্যানার্জী ও কিশোরীলাল ঘোষ। বাকী আসামীরা যাবজ্জীবন দীপান্তর, ১২ বছর, ২০ বছর, সাত বছর, পাঁচ বছর, চার বছর ও তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন।

সেশন কোর্টের রায় বা'র হওয়ার আগে ৬৮ বছরের বৃদ্ধ ইঞ্জিনীয়ার মুক্তিরাজ ঠেংদী পুণায় মারা যান। জামিনে মুক্তি পেয়ে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। তিনি বোম্বের শ্রমিক ও কৃষক দলের সভাপতি ছিলেন। মোকদ্দমা সেশন আদালতে শুরু হওয়ার পরে সরকার পক্ষের প্রধান ব্যারিস্টার মিঃ ল্যাংফোর্ড জেমস্ মারা যান। আমরা গিরেফতার হয়েছিলেম ১৯২৯ সালে, ২০শে মার্চ তারিখে, আর সেশন জজ আমাদের সাজা দিয়েছিলেন ১৯৩৩ সালের ১৬ই জানুয়ারী তারিখে। মোকদ্দমার যে কাগজপত্র (পেপার বুক) ছাপা হয়েছিল তার পরিমাণ ছিল ফুলস্ক্যাপ ফলিও সাইজের দশ হাজার পৃষ্ঠা। মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা ছিল পৃথিবীর বৃহত্তম ও দীর্ঘতম রাষ্ট্রীয় বিচার। মীরাট মোকদ্দমার মতো মস্কো ও রাইখস্টাগ মোকদ্দমা ক্রমাগত প্রতিদিন চলেনি।

সেশন আদালতের রায় বা'র হওয়ার আগে শওকত উসমানী এমন সব অশোভন আচরণ করতে লাগলেন যে তাঁকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি হতে বহিষ্কার করা ছাড়া অন্য উপায় থাকল না। সেশন আদালতে নিম্বকরের ১২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল। তার পরে তিনিও দুর্বলতা প্রকাশ করতে লাগলেন। তার ফলে তিনিও পার্টি হতে বহিষ্কৃত হলেন।

মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা হতে ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলা দেশের জেলে ও ক্যাম্পে দণ্ডিত ও বিনা বিচারে আটক সন্ত্রাসবাদী বন্দীরা মার্কসীয় সাহিত্যের অধ্যয়ন শুরু করে দেন। আন্দামানের জেলেও দণ্ডিত বন্দীরা তা করেন। এই ব্যাপারে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কলকাতা কমিটিরও অবদান ছিল। মুক্তি পাওয়ার পরে এসব বন্দীর মধ্য হতে শত শত লোক ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন।

১৯২৯ সালের মার্চ মাসে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আমাদের মামলা শুরু হওয়ার পরে ইউরোপে এম. এন রায় কমিউনিস্ট পার্টি হতে বহিষ্কৃত হন। এ সময়ে তিনি কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের প্রাচ্য বিভাগের ভার

পেয়েছিলেন। তাঁর বহিষ্কারের কারণ আমার জানা নেই। তাঁর কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আমারও নালিশ ছিল। তাঁর বহিষ্কারের বহু কারণের মধ্যে আমার নালিশও একটি কারণ ছিল কিনা তার খবর আমি নিতে পারিনি। ভারতে ফিরে আসার পরে রায় অবশ্য প্রচার করেছেন যে আমার নালিশও তাঁর পতনের একটি কারণ।

মীরাট জেলে এম এন রায়ের বহিষ্কারের খবর পাওয়ার পরে আমরা ভাবলাম যে রায় এবারে দেশে ফিরে আসবেন এবং একটা কিছু গোলমাল করার চেষ্টা করবেন। সত্যই তিনি ভারতে ফিরলেন এবং "ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি" গড়ে তোলার জন্য 'বিপ্লবী কমিটি'র স্বাক্ষরে প্রচার-পত্র-সমূহ বা'র করতে লাগলেন। তিনি জানতেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি আনুষ্ঠানিকভাবে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সহিত যুক্ত* নয়। তাই তাঁর এই সব ইশ্‌তেহারের দ্বারা তিনি তাঁকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্যে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালকে বাধ্য করবেন, সম্ভবত এই ছিল তাঁর আশা।

মীরাট গিরেফ্‌তারের পরে

এম. এন. রায় তাঁর চালে ভুল করেছিলেন। ১৯৩০ সালে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি আনুষ্ঠানিকভাবে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের অঙ্গীভূত হয়ে গেল। এর পরে এম. এন. রায় তাঁর বিপ্লবী কমিটির পক্ষ হতে ইশ্‌তেহার বা'র করা বন্ধ করে দিলেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সহিত একই সময়ে ইন্দো-চায়নার কমিউনিস্ট পার্টিও কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের অঙ্গীভূত হয়েছিল। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির খসড়া কর্মসূচীও** এই সময় প্রকাশিত হলো। ১৯৩০ সালের ১৯শে ডিসেম্বর তারিখে এই কর্মসূচী "ইন্টারন্যাশনাল প্রেস করেসপণ্ডেন্সে" ছাপা হয়েছিল। কিন্তু বোম্বের পার্টি নেতারা এই কর্মসূচীর ভিত্তিতে সারা ভারত পার্টিকে সংহত করতে তো পারলেনই না বরঞ্চ মত-পার্থক্যের দরুন তাঁদের নিজেদের মধ্যেও ভাঙাভাঙি হয়ে গেল।

*affiliated

**The Draft Platform of Action of the Communist Party of India.

অগত্যা কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সংযুক্তীকরণ সাময়িকভাবে স্থগিত করে রাখল। সারা দেশে পার্টির বিচ্ছিন্নতা চরম আকারে দেখা দিল।

এই সময়ে কলকাতার কমরেড আবদুল হালীম, রণেন্দ্রনাথ সেন ও সোমনাথ লাহিড়ী প্রভৃতি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কলকাতা কমিটির নাম দিয়ে পার্টির কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সোবিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সেনট্রাল কমিটির বর্ধিত সভায়, না, কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের কার্যনির্বাহক কমিটির বর্ধিত সভায় (আমার ঠিক মনে নেই) একবার কমরেড স্তালিনও কলকাতা কমিটির কাজের কথা উল্লেখ করেছিলেন। কলকাতা কমিটির তরফ হতে পার্টিকে আবার সারা-ভারত রূপ দেওয়ার জন্য বোম্বের পার্টি নেতাদের বারে বারে অনুরোধ করেও কোনও ফলোদয় হলো না। তার তাঁরা নানান সূত্রে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের নিকট রিপোর্ট পাঠাতে লাগলেন, নিজেদের কাজ তো তাঁরা চালিয়ে যাচ্ছিলেনই। ১৯৩২ সালে একটি সুযোগ উপস্থিত হওয়ায় ফিলিপ স্প্রাট, বেন্ ব্রাডলে এবং আমিও একটি রিপোর্ট মীরাট হতে পাঠাতে পেরেছিলেম।

এইসব রিপোর্ট ফলপ্রসূ হয়েছিল। প্রথমে ১৯৩২ সালের মে মাসে চীনের, জার্মানির ও গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিত্রয়ের যুক্ত স্বাক্ষরে ভারতে কমিউনিস্টদের নামে একখানা খোলা চিঠি এলো। তাতে ভারতের কমিউনিস্টদের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছিল এবং তাদের অনুরোধ জানানো হয়েছিল যে তারা যেন খসড়া কর্মসূচীর ভিত্তিতে পার্টিকে সারা-ভারত পার্টিতে পরিণত করেন। বৎসরাধিক কাল পরে (১৬ই জুলাই ১৯৩৩) চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির তরফ হতে ভারতের কমিউনিস্টদের নামে আবারও একখানা খোলা চিঠি আসে। এবার তাঁরা তীব্রতর ভাষায় ভারতের কমিউনিস্টদের সমালোচনা করেন। তাঁরা সোবিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নজীর উল্লেখ করে নানানভাবে ভারতের কমিউনিস্টদের বোঝাবার চেষ্টা করলেন

যে সারা-ভারত পার্টি গড়ে তোলা আবশ্যক। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কলকাতা কমিটির কাজের অনেক প্রশংসাও করলেন এবং বললেন :

"এই কারণে আমরা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কলকাতা কমিটিকে স্বাগত জানাই।

"এই কমিটি সর্বশক্তি নিয়োজিত ক'রে সারা-ভারত ভিত্তিতে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার কাজ গ্রহণ করেছে। এই কমিটি পার্টির কাজকে সর্বভারতীয় স্তরে নিয়ে যাওয়ার যে বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে তা উপলব্ধি করতে পেরেছে। এই কমিটিই প্রস্তাব করেছে যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস হতে এই করুণ অধ্যায়কে মুছে ফেলা উচিত যে-অধ্যায়ে আছে ক্ষুদ্র কলহ ও বিচ্ছিন্নতা, আর তার জায়গায় দরকার যে শক্তিশালী একক ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করে ইতিহাসের একটি নূতন পৃষ্ঠার উদ্‌ঘাটন করা।"

আমাদের সেসন আদালতের সাজার বিরুদ্ধে আমরা এলাহাবাদ হাইকোর্টে আপিল করেছিলাম। ১৯৩৩ সালের ৩রা আগষ্ট তারিখে হাইকোর্টের রায় বার হলো, আমাদের সকলের সাজাই কমে গেল। উসমানী, ডাঙ্গে ও আমার সাজা কমে হলো তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড, ফিলিপ স্প্রাটের দু'বছরের সশ্রম কারাদণ্ড, এবং ঘাটে, বেন্ ব্রাডলে, মিরাজকর জোগলেকর, নিম্বকর, সোহন সিং জোশ, আব্দুল মজীদ ও ধরণীকান্ত গোস্বামীর সাজা কমে হলো প্রত্যেকের এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। গোপেন চক্রবর্তীর সাজা কমে গেল সাত মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে। দেশাই, হচিনশন, রাধারমণ মিত্র প্রভৃতি নয়জন বেকসুর খালাস পেলেন। ৩রা আগষ্ট (১৯৩৩) পর্যন্ত ডকটর অধিকারী, অযোধ্যা প্রসাদ, পি. সি. জোশী, শামসুল হুদা ও গোপাল বসাক যতটা কয়েদ খেটেছেন ততটাই হলো তাঁদের সাজা, অর্থাৎ তাঁরা সেদিনই মুক্তি পেলেন। যাঁদের সাজা ক'মে এক বছরের হয়েছিল তাঁরাও ১৯৩৩ সালের নবেম্বর মাসে মুক্তি পেলেন।

আবার একটি সারা-ভারত পার্টি

কমিউনিস্ট পার্টির যে-সভ্যরা মুক্তি পেলেন তাঁরা কলকাতা কমিটির সহযোগে পার্টিকে আবার পাঁক হতে টেনে তোলার চেষ্টা শুরু করলেন। বোম্বের কমরেডদের মধ্যে অনেকে সঙ্গে এলেন, অনেকে সঙ্গে এলেন না। এই প্রচেষ্টার ভিতর দিয়ে ১৯৩৩ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় পার্টির একটি গোপন সম্মেলন হলো। তাতে পার্টির নূতন রাজনৈতিক প্রস্তাব ও নূতন গঠনতন্ত্র গঠিত হলো। পার্টির নূতন কেন্দ্রীয় কমিটিও এই সম্মেলনে নির্বাচিত হলো। ডক্টর গঙ্গাধর অধিকারী পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী নির্বাচিত হলেন। কমরেড বেন্ ব্রাড্‌লে এই সব রিপোর্ট নিয়ে ইউরোপে চলে গেলেন এবং এসব রিপোর্ট যথারীতি কমিউনিস্ট ইন্টারনাশনালের নিকটে দাখিলও করা হলো। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি আবার তৃতীয় কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনলের অঙ্গে (সেকসনে) পরিণত হলো।

কাযত বে-আইনী প্রতিষ্ঠান হলেও ভারত গবর্নমেণ্ট আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে আগে কখনও বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলে ঘোষণা করেনি। মীরাট মামলার আপীলে এলাহাবাদ হাইকোর্ট যে রায় দিল তাতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিরূপিত করা হয়। তাই, ১৯৩৪ সালে ভারত গবর্নমেণ্ট আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করল যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ প্রতিষ্ঠান।

আর একটি কথা ব'লে আমি আমার এই লেখা শেষ করব। আমাদের হাল আমলের নেতৃস্থানীয় বহু কমরেডের ধারণা যে কমরেড আর পাম দত্ত ও বেন্ ব্রাড্‌লের "সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জনগণের মোর্চা"* নামক দলীল বা'র হওয়ার আগে (১৯৩৬) ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যরা কখনো ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সভ্য হননি। এটা একেবারেই সত্য নয়। পার্টি গড়ার কাজে প্রথম যারা নেমেছিলেন তাঁরা কংগ্রেসেও ছিলেন। একমাত্র আমিই ১৯২৬ সালের আগে কংগ্রেসের সভ্য হইনি। ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে

* The Anti-Imperialist People's Front.

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির যে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়েছিল তার তিনজন সভ্য সারা ভারত কংগ্রেস কমিটিরও সভ্য ছিলেন। মীরাট মামলার বন্দীদের মধ্যে সারা-ভারত কংগ্রেস কমিটির সভ্য ছিলেন সাতজন। তার মধ্যে পাঁচজন ছিলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য। আরও জেনে রাখা ভালো যে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে কমিউনিস্টরাই বারে বারে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করতেন এবং কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের বিরোধিতায় বারে বারে ভোটে হেরে যেতেন। ১৯২৭ সালে কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পাস হয়েছিল। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও আরও অনেক কংগ্রেস নেতা এ প্রস্তাবের সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ডোমিনিয়ন স্টেটাসের সংবিধান খসড়া তৈয়ার করার জন্য পণ্ডিত মতিলাল নেহরুকে সভাপতি করে একটি কমিটিও গঠিত হলো। এই সংবিধান রচিত হয়েছিল। ১৯২৮ সালের কলকাতা কংগ্রেসে মাদ্রাজের প্রস্তাব নাকচ হয়ে গেলো এবং নেহরু রিপোর্ট (সংবিধান) গৃহীত হলো। সাবজেক্ট কমিটিতে স্বাধীনতা প্রস্তাবের ওপরে ভোটের দিন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু অনুপস্থিত থাকলেন। সুভাষচন্দ্র বসু গান্ধীজীর সঙ্গে প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিলেন। কংগ্রেসের খোলা অধিবেশনে শ্রীবসু প্রস্তাবের পক্ষে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। কংগ্রেসের অধিবেশনেও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যরা স্বাধীনতা প্রস্তাবের প্রধান প্রবক্তাদের মধ্যে ছিলেন। আমাদের পার্টি সভ্যদের এইসব কথা জানা উচিত। তা না হলে তারা ভবিষ্যতে পার্টির সঠিক ইতিহাস রচনা করতে পারবেন না।